যুগান্তর

তারিখ 27 JUL 2009
পৃষ্ঠা ৪ কলাম

উচ্চ মাধ্যমিকের ফল

শিক্ষকরা যদি পাঠদানে আন্তরিক ও সচেষ্ট হন এবং শিক্ষার্থীরা নিয়মিত পড়াশোনা করে, তাহলে সাফল্য অর্জন কঠিন নয়। স্কুল-কলেজগুলোয় ইংরেজি ও অংকের শিক্ষকের সংকটের কথা সবারই জানা।

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ফল প্রকাশে এবার প্রথমবারের মতো প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে। এর আগে মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে এবং ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশের ব্যবস্থা ছিল। এবার কমপক্ষে তিন শতাধিক কলেজ ও মাদ্রাসায় ফল প্রেরিত হয়েছে ই-মেইলে। আগামীতে সব প্রতিষ্ঠানেই ফল পাঠানো হবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশিত ফলাফলে এইচএসসিতে ৮টি সাধারণ বোর্ডে এবার গড় পাসের হার ৭০ দশমিক ৪৩ ভাগ। গত বছর পাসের হার ছিল ৭৪ দশমিক ৮৫ ভাগ। সাফল্যের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কমেছে। এবার জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যার পাশাপাশি পাসের হার কমলেও লেখাপড়ার উন্নতির বিচারে ছেলেমেয়েরা কিন্তু খারাপ করেনি। কেননা, এ ব্যাচটিই ২০০৭ সালে যখন মাধ্যমিক পাস করে বেরিয়েছিল, তখন পাসের হার ছিল ৫৮ দশমিক ৩৬ ভাগ। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, ছাত্র ও দলীয় রাজনীতি যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশকে বিঘ্নিত ও কলুষিত না করে তাহলে পাঠদান পদ্ধতিসহ সার্বিক পরিবেশ উন্নত হয়। গত কয়েক বছর ধরে আইন-শৃংখলা বাহিনীসহ সংশ্লিষ্টদের প্রচেষ্টার ফলে পরীক্ষায় নকল প্রবণতাও কমেছে অনেকাংশে। শিক্ষার্থীরাও বুঝতে পারছে, বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে লেখাপড়া ভালোভাবে চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি কৃতিত্বপূর্ণ ফল অর্জনের কোন বিকল্প নেই। এর ইতিবাচক প্রভাব আমরা দেখতে পাই ৭৫৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একেবারে একশ' ভাগ পাসের মাধ্যমে। স্বীকার করতেই হবে, হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ ইত্যাদি না থাকা এবং দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুকূল থাকায় ফলাফল আরও ভালো আশা করা গিয়েছিল। দুর্ভাগ্য যে, ৪১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাস করেনি কোন শিক্ষার্থী। শিক্ষামন্ত্রী অবশ্য এসব কলেজের এমপিও স্থগিত রাখার হুমকির পাশাপাশি ভরাডুবির কারণ অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যদিকে এমপিওভুক্ত না হলেও কুমিল্লা কমার্স কলেজ, শহীদুল আলহাজ্ব আবু তাহের কলেজ এবং বুড়িচং উপজেলার সোনার বাংলা কলেজ তিনটি কুমিল্লা বোর্ডে যথাক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম ও নবম স্থানে অবস্থান করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে সবাইকে। গত বছরও কলেজ তিনটির ফলাফল ছিল সন্তোষজনক। শিক্ষকরা যদি পাঠদানে আন্তরিক ও সচেষ্ট হন এবং শিক্ষার্থীরা নিয়মিত পড়াশোনা করে, তাহলে সাফল্য অর্জন কঠিন নয়। স্কুল-কলেজগুলোয় ইংরেজি ও অংকের শিক্ষকের সংকটের কথা সবারই জানা। সেক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে শিক্ষার্থীদের ওপর হঠাৎ করে কিছু চাপিয়ে দেয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত, সেটা ভেবে দেখা প্রয়োজন। আগামীতে সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি নিয়েও ভাবতে হবে গভীরভাবে। এর পাশাপাশি ইংরেজি, অংক, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষক তৈরি করতে হবে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। আগামী বছর থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষায়ও দুইশ' নম্বরের ইংরেজি পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা রয়েছে। এক্ষেত্রে সুষ্ঠু ও সমন্বিত সিলেবাস অনুসরণ করা আবশ্যক। পরীক্ষার ফলাফল যত ভালোই হোক না কেন এবারও প্রায় ৫৮ হাজার শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার নিমিত্ত কোন ভালো বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা বিশেষায়িত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে না। সবারই যে উচ্চশিক্ষা পেতে হবে, এমন কথা নেই। তবে শিক্ষার্থীরা যাতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে সেজন্য মানসম্পন্ন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট গড়ে তোলা আবশ্যক। বিদেশে নার্স, রাঁধুনী, ক্রেন অপারেটর, ইলেকট্রিশিয়ান, রাজমিস্ত্রি, প্লাম্বার ফিটার, হোটেল কর্মচারীর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। অতএব আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। কর্মসংস্থানমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। এইচএসসিতে যারা পরীক্ষা দিয়েছে তারা সবাই এসএসসি পাস করে এসেছে, দু'বছর কলেজে পড়াশোনা করেছে, বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তারপরও পরীক্ষায় পাস না করার কী কারণ থাকতে পারে? এ ব্যর্থতার দায় শুধু শিক্ষার্থীর ওপর চাপানো ঠিক হবে না। এক্ষেত্রে শিক্ষক/অভিভাবক তথা শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার দায়িত্ব আছে। তারা সে দায়িত্ব পালন করলে পরীক্ষায় এত শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হতো না। ভবিষ্যতে এইচএসসিসহ সব পাবলিক পরীক্ষায় শতভাগ শিক্ষার্থী যাতে পাস করে সে ব্যবস্থা নিতে হবে।